ছাত্ররাজনীতি বন্ধ নয়, সংস্কার প্রয়োজন

ড. আনোয়ারউল্লাহ চৌধুরী

০৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫
০০:০০

শেয়ার

অ +

অ -

সাম্প্রতিক আগস্ট আন্দোলনের মাধ্যমে দীর্ঘ সাড়ে ১৫ বছরের স্বৈরাচারী শাসকের অবসান ঘটেছে। এই আন্দোলনের এক পর্যায়ে দেশের বেশির ভাগ রাজনৈতিক দল সম্পৃক্ত হলেও আন্দোলনের মূল সূচনাকারী এবং সমাপ্তকারী হিসেবে দায়িত্ব পালন করে দেশের বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা। শিক্ষার্থীরা এভাবে আন্দোলনে যুক্ত না হলে রাষ্ট্রক্ষমতায় জেঁকে বসা দুর্বিনীত সরকারকে কোনোভাবেই হটানো সম্ভব হতো না। কারণ বিগত সাড়ে ১৫ বছরে দেশের রাজনৈতিক দলগুলো সরকারের বিরুদ্ধে কঠোর আন্দোলন-সংগ্রাম করে ভয়াবহ নির্যাতনের শিকার হয়েছে।

আন্দোলন চলাকালে এক হাজারেরও বেশি মানুষ, যাদের বেশির ভাগই শিক্ষার্থী, নিহত হয়েছে এবং আহত হয়েছে আরো বেশিসংখ্যক মানুষ। আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীরা তাদের নিজ নিজ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ফিরে গেছে। মাঝেমধ্যে এমন প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হয় যে দেশের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ছাত্ররাজনীতি বন্ধ করা উচিত কি না? একজন শিক্ষাবিদ হিসেবে আমি ব্যক্তিগতভাবে এই প্রশ্নের উত্তর খোঁজার চেষ্টা করেছি। কিন্তু ছাত্ররাজনীতি বন্ধ করার পেছনে তেমন কোনো যুক্তি খুঁজে পাইনি।

বাংলাদেশের রাজনৈতিক আন্দোলনের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে, প্রতিটি আন্দোলনেই শিক্ষার্থীরা কোনো না কোনোভাবে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে। দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে ভারত ও পাকিস্তান বিভক্ত হলে আমরা অর্থাৎ এই অঞ্চলের

মানুষ পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হই। এ দেশের মানুষ আশা করেছিল, পাকিস্তানের অধীনে তারা ভালো থাকবে। অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ভোগ করবে।

কিন্তু কিছু দিন যেতে না যেতেই পাকিস্তানি শাসকচক্রের আসল পরিচয় প্রকাশিত হয়। ১৯৪৮ সালে ঘোষণা করা হয় পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে উর্দু। কিন্তু সেই সময় পাকিস্তানের মোট জনসংখ্যার ৫৬ শতাংশই ছিল বাংলাভাষি। কাজেই বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতিদানের জন্য এ দেশের ছাত্র-জনতা দাবি জানাতে থাকে। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারি ঢাকার রাজপথ ছাত্রদের বুকের রক্তে রঞ্জিত হয়।

সেদিন যদি ছাত্ররা আত্মত্যাগ না করত, তাহলে বাংলা ভাষার মর্যাদা বিনষ্ট হতো এটা নিশ্চিত করেই বলা যেতে পারে। পরবর্তী সময়ে পাকিস্তান আমলে যত আন্দোলন-সংগ্রাম হয়েছে তার পেছনে একুশে ফেব্রুয়ারির চেতনা নিয়ামক শক্তি হিসেবে কাজ করেছে। প্রতিটি আন্দোলনে ছাত্ররা গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে। কবি হেলাল হাফিজ তাঁর একটি কবিতায় বলেছেন, ‘এখন যৌবন যার যুদ্ধে যাবার তার শ্রেষ্ঠ সময়।’ তার সঙ্গে সুর মিলিয়ে বলা যায়, এখন যে ছাত্র, জাতিকে মুক্ত করার সংগ্রামে নিয়োজিত হওয়ার শ্রেষ্ঠ সময় তার।

১৯৬৯ সালে আইয়ুববিরোধী গণ-অভ্যুত্থান এবং ১৯৭১ সালের স্বাধীনতাযুদ্ধে এ দেশের ছাত্র-জনতার গৌরবময় ভূমিকা ছিল। একই বিষয় আমরা প্রত্যক্ষ করি ১৯৯০ সালের এরশাদ সরকারবিরোধী আন্দোলনের সময়। সেই সময় ছাত্ররা যদি মাঠে নেমে না আসত, তাহলে আন্দোলন কতটা সফল হতো তা নিয়ে সংশয় রয়েছে। বিভিন্ন সময় আন্দোলনের একটি প্রবণতা লক্ষ করা যায়, তা হলো সরকার সমর্থক ছাত্রসংগঠন সর্বদাই আন্দোলনকারীদের বিপক্ষে অবস্থান গ্রহণ করে। তার পরও অন্যান্য

রাজনৈতিক দলের সমর্থক ছাত্রসংগঠনগুলো একত্র হয়ে মাঠে নামে তখন ক্ষমতাসীন সরকারের পতন অনিবার্য হয়ে ওঠে। আগস্ট আন্দোলনের সময় আন্দোলনকারীদের দমন করার জন্য সরকার সমর্থক ছাত্রসংগঠনকে মাঠে নামানো হয়েছিল। তারা নানাভাবে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের ওপর নির্যাতন চালায়। কিন্তু আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা তাদের উদ্দেশ্য সাধনে অটল থাকার ফলে কোনো ষড়যন্ত্র এবং নির্যাতনই তাদের দমাতে পারেনি। ২০১৮ সালে এই শিক্ষার্থীরাই নিরাপদ সড়কের দাবিতে তীব্র আন্দোলন গড়ে তুলেছিল। একইভাবে সরকারি চাকরিতে কোটা সংস্কারের দাবিতে আন্দোলন করে সরকারকে তাদের দাবি মেনে নিতে বাধ্য করেছিল।

এখন প্রশ্ন হলো, ছাত্ররাজনীতির এত গৌরবময় অতীত থাকা সত্ত্বেও কোনো কোনো মহল থেকে ছাত্ররাজনীতি বন্ধ করার জন্য দাবি উত্থাপিত হচ্ছে কেন? বিভিন্ন আন্দোলনে অংশ নিয়ে ছাত্ররা যেমন গৌরবের অধিকারী হয়েছে, আবার এদেরই কোনো কোনো অংশ নানা ধরনের অপকর্মে যুক্ত হয়ে নিজেদের কলুষিত করেছে। যেসব ছাত্র বুয়েট শিক্ষার্থী আবরার হত্যাকাণ্ডে যুক্ত ছিল তারা নিশ্চিতভাবেই ক্ষমাহীন অপরাধ করেছে। স্বৈরাচারী সরকারের একটি সাধারণ প্রবণতা থাকে, তা হলো তারা শিক্ষার্থীদের নানা ধরনের অন্যায় কাজে যুক্ত হতে প্রলুব্ধ করে। বিগত সাড়ে ১৫ বছরের একটানা শাসনামলে সরকার দলের সমর্থক ছাত্রসংগঠনের নেতাকর্মীদের মাস্তানে পরিণত করা হয়েছিল। হলে সিট দখল, চাঁদাবাজি, অস্ত্র বাণিজ্য, টেন্ডারবাজিতে তারা যুক্ত হয়েছিল। নিরীহ শিক্ষার্থীদের ওপর নানাভাবে নির্যাতন চালানো ছিল তাদের নিত্যদিনের কাজ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ কোনো বিশ্ববিদ্যালয়েই বিরোধী মতাদর্শের শিক্ষার্থীদের কোনো স্থান ছিল না। তারা প্রকাশ্যে মিটিং মিছিল করতে পারত না। বিরোধী মতের ছাত্রদের দেখলেই মারধর করা হতো। বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের সরকারদলীয় ছাত্রসংগঠনের শীর্ষস্থানীয় নেতাদের অনেকেই কোটি কোটি টাকার মালিক। নিজেদের দুষ্কর্মের কারণে নির্বাচনে জয় লাভ করতে পারবে না এই আশঙ্কায় বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রসংসদের নির্বাচন বন্ধ রাখা হয়েছিল। ছাত্রসংসদ নির্বাচন যদি নিয়মিতভাবে অনুষ্ঠিত না হয়, তাহলে ভবিষ্যৎ নেতৃত্বে গড়ে উঠবে কিভাবে?

অতিমাত্রায় দলীয়করণ হওয়ার কারণে প্রশাসন সরকারদলীয় ছাত্রসংগঠনের নেতাদের দুষ্কর্মের বিরুদ্ধে কোনো উচ্চবাচ্য করতে পারে না। তাঁরা মনে করেন, কোনো কারণে সরকারদলীয় ছাত্রসংগঠনের নেতাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হলে তার চাকরি থাকবে না। তাই যাঁরা ভাইস চ্যান্সেলর বা এ ধরনের বিভিন্ন দায়িত্বে থাকেন তাঁরা সরকারদলীয় ছাত্রনেতাদের তোয়াজ করে চলেন। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে একান্ত দলীয় বিবেচনায় অযোগ্য লোকদেরও ভাইস চ্যান্সেলর হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছিল। অযোগ্য লোকদের কোনো প্রশাসনিক দায়িত্বে নিয়োগ দিলে তাঁর পক্ষে সঠিকভাবে দায়িত্ব পালন করা কোনোভাবেই সম্ভব

নয়। সাম্প্রতিক আন্দোলনের পর বিভিন্ন স্থানে শিক্ষকদের ওপর ক্ষুব্ধ ছাত্ররা আক্রমণ চালিয়েছে, অপদস্থ করেছে। এটা খুবই দুর্ভাগ্যজনক এবং নিন্দনীয় একটি ব্যাপার। একজন শিক্ষাবিদ হিসেবে আমি কখনোই এমন কাজ সমর্থন করতে পারি না। কিন্তু আমরা কি ভেবে দেখেছি কেন ছাত্ররা এমন আচরণ করেছে পিতৃতুল্য শিক্ষকদের সঙ্গে? একজন শিক্ষক প্রতিটি শিক্ষার্থীকে একই দৃষ্টিতে দেখবেন এটাই কাম্য। কিন্তু তিনি যদি শিক্ষকের আসনে বসে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে রাজনৈতিক মতাদর্শগত ভিন্নতার কারণে কোনো ছাত্রের সঙ্গে বিরূপ আচরণ করেন, তাহলে সেই ছাত্র তো ক্ষুব্ধ হবেই। একজন শিক্ষকের নিজস্ব রাজনৈতিক মতাদর্শ থাকতেই পারে, কিন্তু শিক্ষক, বিশেষ করে ভাইস চ্যান্সেলর বা কোনো কলেজের প্রিন্সিপাল হিসেবে দায়িত্ব পালনের সময় সেই রাজনৈতিক মতাদর্শ প্রদর্শন করা কোনোভাবেই কাম্য হতে পারে না। একজন সত্যিকার শিক্ষাবিদ কখনোই দৃশ্যমান কোনো রাজনৈতিক কার্যক্রমে অংশ নিতে পারেন না। কিন্তু বিগত সরকারের আমলে দেখা গেছে শিক্ষকরাও সরাসরি রাজনৈতিক কর্মসূচিতে অংশ নিচ্ছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর থেকে শুরু করে কোনো পর্যায়েই রাজনৈতিক বিবেচনায় শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া উচিত নয়। রাজনৈতিক বিবেচনায় নিয়োগপ্রাপ্ত একজন শিক্ষক কখনোই সরকারের বিরুদ্ধে মাথা উঁচু করে কথা বলতে পারেন না।

বর্তমানে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় এবং অন্যান্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে চাকরিতে নিয়োগদানের ক্ষেত্রে দলীয়করণের পাশাপাশি ঘুষ গ্রহণের অভিযোগও পাওয়া যায়। কোটি কোটি টাকা আর্থিক লেনদেনের মাধ্যমে অযোগ্য কোন কোন ব্যক্তি ভাইস চ্যান্সেলর বা কলেজের প্রিন্সিপাল হিসেবে নিয়োগ লাভ করেছেন বলে বিভিন্ন সূত্র দাবি করে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর বা কলেজের প্রিন্সিপালদের অনেকের বিরুদ্ধেই ব্যাপক দুর্নীতির অভিযোগ উত্থাপিত হচ্ছে। বিশেষ করে নির্মাণকাজ থেকে অর্থ গ্রহণ করার অভিযোগ উত্থাপিত হচ্ছে তাদের বিরুদ্ধে। একজন শিক্ষক যার কাছ থেকে সাধারণ শিক্ষার্থীরা চারিত্রিক সার্টিফিকেট গ্রহণ করে থাকে সেই শিক্ষকের বিরুদ্ধে যদি দুর্নীতি এবং অর্থ আত্মসাতের অভিযোগ উঠে, তাহলে এর চেয়ে নিন্দনীয় কাজ আর কি হতে পারে। কাজেই আমি মনে করি, মাথা ব্যথার জন্য যেমন মাথা কেটে ফেলা কোনো সমাধান নয়। মাথা ব্যথা হলে ওষুধ দিতে হবে। ঠিক তেমনি কলুষিত হয়েছে বলে ছাত্ররাজনীতি বন্ধ করতে হবে এটা কোনোভাবেই কাম্য নয়। ছাত্ররাজনীতিকে বরং সুস্থ ধারায় ফিরিয়ে আনার জন্য উদ্যোগ নেওয়া যেতে পারে।

লেখক : সাবেক উপচার্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও বাহরাইনে বাংলাদেশের সাবেক রাষ্ট্রদূত